‘দুই বাংলা’ ধান্দাবাজি

মলয় রায়চৌধুরী

গল্পঝি পত্রিকার -- পত্রিকাটি বার্ষিক -- দ্বিতীয় সংখ্যায় (জানুয়ারি ২০০৩)
গল্পের মাটি ও আকাশ শিরোনামে অশ্রুকুমার শিকদার লিখিত প্রবন্ধের অংশবিশেষ এখানে তুলে দিয়ে পশ্চিমবাংলার ভালগার উদ্ব াস্তুবাদীদের প্রতি আক্রমণাত্মক ডিসকোর্সটি আমি শু করব ঃ

“আমি সাহিত্য আকাদেমির বাংলা উপদেশকমন্ডলীর সদস্য ছিলাম পনেরো বছর ধরে। ...আমার প্রস্তাবমত বাংলা গল্প সংকলন...প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ... চতুর্থ খন্ডের জন্য যে - সব গল্পকারের নাম আমি বেছে নিয়েছিলাম, তার অনেকগুলি নতুন উপদেশকমণ্ডলীর উপসমিতি মেনে নিতে দ্বিধান্বিত ছিলেন। ... আমি দু-তিনজনগল্পকারের নাম রেখেছিলাম যাঁরা উত্তরবঙ্গে ব া পূর্বভারতে অন্য রাজ্যে বসবাস করে চমৎকার বাংলা গল্প লিখছেন। তাঁদের অন্তর্ভুক্তির ন্যায্যতা নিয়েও উপসমিতির সভায় প্র তে ালা হয়। আমার মনে হয়েছিল সদস্যরা খোলা মনের পরিচয় দিচ্ছেন না। তাঁরা একটি বিশেষ গোষ্ঠীর গল্পকারদেরই তুলে ধরতে চ ান।”

উদ্ধৃতিটিতে ন্যায্যতা শব্দটি লক্ষণীয়; কেন না শব্দটা শোনা মাত্র প্র ওঠে তা কোন জ্ঞানতাত্ত্বিক জগতে প্রসবিত?
গত পনের - কুড়ি বছর যাবত কলকাতার বইবাজারে “দুই বাংলা” নামে একটি অভিব্যক্তি নিয়ে কিছু লোক আাদে আটখানা। এই লোকগুলো কারা? বস্তুত এই লোকগুলোর জ্ঞানমন্ডলেই পয়দা হয়েছে ন্যায্যতা নামক প্রাগুক্ত ব্যাপারটি। দেশ ভাগ হবার পর কুড়ি বছর পর্যন্ত যে - অভিব্যক্তি দেখা দেয়নি, তা হঠাৎ তুমুল ভাবে দেখা দিল কেন? স্বাধীন বাংলাদেশের বদলে কলকাতাতেই বা কেন দেখা গেল অভিব্যক্তিটি নিয়ে মাতামাতি? কোনও ডিসকোর্সই সমাজের ক্ষমতা - নিরপেক্ষ নয়। এবং জ্ঞান-ই ক্ষমতা। কাদের স্ব ার্থের আস্ফালনরূপে দেখা দিল ‘দুই বাংলার অমুক কবিতা’ ‘দুই বাংলার তমুক গল্প’ নামে হুদো - হুদো বই যাতে সংকলিত কবি - লেখকরা প্রতিটি ক্ষেত্রে অশ্রুকুমার কথিত বিশেষ গোষ্ঠী?
দুই বাংলা -- দুই বাংলা করে যাঁরা দুহাত তুলে নাচানাচি করেন, স্বভাবতই তাঁদের অবচেতনে ভারত রাষ্ট্রের তুলনায় বাংলাদেশ র াষ্ট্রটি অনেক গুত্বপূর্ণ। এঁরা ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের বাঙালিদের অস্তিত্বকে নস্যাৎ করে, নিজেদের অস্তিত্বকে বৈধতা প্রদান করছেন বাংলাদেশ রাষ্ট্রটির মাধ্যমে। দেশ ভাগের পর প্রথম কুড়ি বছরে এই লোকগুলোকে দেখা যায়নি কেননা তখন তাঁরা অল্পবয়স্ক এবং সাহিত্যিক ডিসকোর্সের এলাকাটি দখল করেননি। সাহিত্যিক ডিসকোর্সের এলাকাটি তাঁদের দখলে আসে প্রাতিষ্ঠা নিক সংস্থাগুলোকে (মহাকরণ, মিডিয়া, আকাদেমি, ঝিবিদ্যালয় ইত্যাদি) দখল করে তাঁদের নিজের প্রতিবিম্ব অনুযায়ী রূপায়িত করার পর। অবচেতনায় এঁদের অপর একটি উদ্দেশ্য ছিল, তা হল দখলকারীদের ভারতীয়তা -- বিরোধিতা, সমগ্র ভারতবর্ষের বহুত্ব থেকে নিজেদের পৃথক করে এক - ধরণের মোনোসেন্ট্রিজম নির্মাণ।
জবরদখল ভাবকল্পটি নৈতিক বৈধতা পাওয়া আরম্ভ করেছিল দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনের ঠিক আগে। পশ্চিমবঙ্গে বাড়ি, ঘর, খেত, জমি ফুটপাত, মন্দির, এলাকার নাম, রূপক, প্রতীক, স্কুল, কলেজ, প্ল্যাটফর্ম, অভিব্যক্তি, খবর, উচ্চারণ, বানান, অভিনয়, দেয়াল - লিখন, গালমন্দ, প্রবাদ, আচরণ, ধর্মানুষ্ঠান ইত্যাদি সর্বত্র প্রসারিত হচ্ছিল ভাবকল্পটি। প্রায় প্রতিটি শহরে ও গঞ্জে অন্যের জমি জবরদখল করে ক্লাব নামক অনুস্তর ক্ষমতার ঘাটি প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল। এর ফলে চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের পর থেকে যে পচনে পশ্চিমব াংলার সমাজদেহ আক্রান্ত হয়, তা আরও ব্যাপক ও গভীর হয়ে গেছে কালক্রমে। দখল প্রক্রিয়া থেকে ‘মস্তান’ নামে একটি নতুন র াজনৈতিক প্রাণী জন্মায় পশ্চিমবঙ্গে, এবং অনুস্তর ক্ষমতার মালিকানা তাদের ওপর বর্তায়। তাদের সাহায্যে গড়ে ওঠে ক্ষমতার পিরা মিডগুলো। অথাৎ পশ্চিমবাংলার পচনের সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে বেড়ে উঠেছে ‘দুই বাংলা’ অভিব্যক্তিটি। এই যে ‘দুই বাংলা’ ক্ল াবের লোকেরা, এরাই কিন্তু সাহিত্যিক ডিসকোর্সকে কুক্ষিগত করার ষড়যন্ত্রে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎকে ধবংস করে তার বিকল্প হিস াবে বাংলা আকাদেমি চালু করেছে।
যেহেতু ‘দুই বাংলা’ একটি সাহিত্যিক সংকীর্ণতা - কেন্দ্রিক ভাবকল্প, তাই তার আওতা থেকে প্রথমে বাদ দেওয়া হয়েছে ভারতবর্ষের

অন্যান্য অঞ্চলের বাঙালিদের। তারপর তাকে আরও সংকীর্ণ করে পশ্চিমবাংলার অন্যান্য জেলাকে বাদ দিয়ে ডিসকোর্সটিকে কলক াতাকেন্দ্রিক করে ফেলা হয়েছে। এর অর্থ হল যে 'দুই বাংলা' ব্রান্ডের লোকগুলো, যাদের আমি ভালগার উদ্বাস্তুবাদী বলছি, এর া মেদিনীপুর - কুচবিহারের চেয়ে বগুড়া - বরিশালের প্রতি দায়বদ্ধ। প্রকারান্তরে এরা ভারতবর্ষের সংবিধানের মূল্যবোধকে হেয় প্রতিপন্নকরছে; সংবিধানের সম্প্রদায় নিরপেক্ষতা ও বহুত্ববাদকে খেলো করে ফেলছে। কলকাতার বাইরে পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলে ায় অনুস্তর সংস্কৃতির যে বৈচিত্র্য ও বৈভিন্ন্য, তার সঙ্গে নিজেদের পরিচিত করে তোলার চেষ্টা করেনি এরা। ভারতবর্ষ সম্পর্কে এদের জ্ঞান কুন্ডু স্পেশালে ভ্রমণের। এই বিশেষ গোষ্ঠীর লোকেদের ছোটগল্পে সে কারণে আমরা পাই কেবল শহুরে মধ্যবিত্তের কারবার। ভাষার যে সংগঠন বৈচিত্র্য পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন জেলায় আমার প্রত্যক্ষ করি, কিংবা ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের বাঙালিদের কথ াসংগঠনের বৈচিত্র শোনা যায়, তা কখনও প্রতিফলিত হয় না 'দুই বাংলা' ব্যান্ডের ভালগার উদ্বাস্তুবাদীদের গল্প - উপন্যাসে

ভালগার উদ্বাস্তুবাদীদের চাপে সাহিত্যের ভাষা হয়ে গেছে একঘেয়ে। গল্প - উপন্যাস তাঁরা লেখেন ত্রেতার ভাষার। এমনকি দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনের সময়েও কলকাতা আর তার আশেপাশে আদিনিবাসীরা যে ধরণের শব্দাবলী ব্যবহার করতেন, তার অধিক াংশলোপাট হয়ে গেছে। চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের পর থেকে কলকাতা শহরের ক্ষমতাকেন্দ্র গুলো যখন 'দুই বাংলা' ব্র্যান্ডের বিশেষ গোষ্ঠীর দখলে চলে গেল, তখন থেকে কলকাতার আদিনিবাসীদের বাড়ির পুরকর এমনভাবে বৃদ্ধি করা হয় যাতে শহরের কেন্দ্রস্থল থেকে বিতাড়িত হয়ে তাঁরা শহর তলির দিকে চলে যেতে বাধ্য হন। আদিনিবাসীরা অঞ্চলটি ত্যাগ করায় স্বাভাবিক ভাবেই ভাষার আদিরূপটিনষ্ট হয়ে একপ্রকার একঘেয়ে ভাষার জন্ম হয়, যে ভাষায় এখন বাণিজ্য সাহিত্যের রমরমা।

ভাষার গঠনকে, ভাষাসৃজনকে, বাক্যবিন্যাসকে গুত্ব দেবার বদলে 'দুই বাংলা' ব্রান্ডের লোকেরা প্লট নিয়ে মাতামাতি করে, চরিত্রের কারবার আর রকমফের নিয়ে আলোচনা করে। তারা ভুলে যায় যে বাংলা ভাষার গদ্য মাত্র দুশো বছরের শিশু, যখন কিনা ইউরে াপের ভাষাগুলো প্রবীণ। এই 'দুই বাংলা' ব্র্যান্ডের লেখকদের প্রশ্ন করার সময় এসেছে যে তাঁদের একজনও কেন দস্তয়েভস্কি, ফকনার, মার্কাজ বা রুশডির পর্যায়ের অন্তত একটা প্যারাগ্রাফও লিখতে পারলেন না। আসলে তাঁদের অনুশীলনের সময় নেই। এক তো তঁ াদের হাতে দিস্তে -- দিস্তে লেখার প্রতিদিনকার ডিউটি, তার ওপর আকাদেমির সদস্যতার জন্যে খেয়োখেয়ি, পুরস্কার পাবার জন্যে উমেদারি, সরকারকে বই বিত্রির জন্যে ধরাধরিতে সময় চলে যায়। তাই 'দুই বাংলা' নামক মঞ্চে দাঁড়িয়ে তাঁরা নিজের ফক্কিকারি চ াপা দেবার চেষ্টা করেন। এই অবস্থায়, যাঁরা 'দুই বাংলা' ধান্দাবাজির বাইরে নিজের কাজ করে চলেছেন, বাংলা গদ্যকে সমৃদ্ধ কর ার দায় তাঁদের ওপর বর্তায়।

কে হাওয়া ৪৯ পত্রিকার জানুয়ারি ২০০৩ সংখ্যায় তাপস মিত্র এভাবে ফাঁস করেছেন ঃ--

"নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় যখন লিখেছিলেন, ছোটগল্প হল লেখকের ব্যক্তিত্বেরই অভিব্যক্তি, তখন তিনি স্বপ্নেও কল্পনা করেননি যে অনেকগুলি অসৎ ও লোভী সাহিত্যিকগণ আঁতুড়ে বাড়ছেন, যাঁদের রচনাগুলি হবে তাঁদের এক - একটি মুখোশের অভিব্যাক্তি। রবীন্দ্রনাথে ঔরসে, প্রজন্ম পরম্পরায়, বাংলা ছোটগল্প গোলগপ্পো নামক বাণিজ্যিক ঘানিতে জুতে গিয়েছিল। ফলস্বরূপ পশ্চিমবঙ্গ ীয় বাংলা কথাসন্দর্ভে ভাষানির্মান ও নবীন ভাষাসংগঠনের কথা তদ্রুপ চিন্তা করা হয় নাই যদ্রূপ স্বভাষায় করেছেন মার্সেল প্রুস্ত, ফিয়োদোর দস্তয়েভস্কি, জেমসজয়েস, উইলিমায় ফকনার, হোর্হেলুই বোহের্স , সলমন শদি, অখতাজ্জামান ইলিয়াস প্রমুখ। পশ্চি মবঙ্গীয় ভূমিপুত্রগণের গোষ্ঠীশ্রুতি সম্প্রচারিত গল্পকাঠামো -- মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুলিয়ার গ্রামবাসীগণ, অথবা উত্তরবঙ্গের র াজবংশীগণ নিজের সমাজে পরস্পরকে যেভাবে গল্প শোনান -- সাহিত্যগ্রাহ্য করার চিন্তা করা হয় নাই। দেশভাগে পাকিস্তানগত উদ্বাস্তুপরিবারপ্রসূত বাণিজ্যিক লেখকগণের সংখ্যাধিক্যে, এবং সাহিত্যের ক্ষমতাকেন্দ্রগুলি তাঁদের অসৎ ও মূল্যবোধহীন প্রতিনিধি - আলোচক ও প্রশাসকগণের কুক্ষিগত হওয়ায় তা বহুকাল সম্ভবত হয় নাই। অপর একটি কারণ হল যে এইসমস্ত ব্যক্তিগণ অধিকাংশ স্বস্বার্থে মহাসন্দর্ভ - তত্ত্বে (মেটান্যারেটিভ) বিশ্বাসী। স্থানিক ঘটনা, ভূমিপুত্রের জীবন ও ভাষা, প্রান্তিকতা, সাংস্কৃতিক যৌগিকতা, অপরত্ববোধ, ক্ষমতার ভঙ্গুরতা, ব্যক্তিসত্তার বহুত্ব, অনেকান্ত স্বর, মানবেতিহাসের অজস্রতা, কেন্দ্রাভিগতা, রূপের বৈভিন্ন্য, সত্যের একাধিক্য, চিন্তাসংগঠনের সংকরতা ইত্যাদি তাঁর স্বীকার করেন না।"

"দুই বাংলা' ডিসেকোর্সটি নিজের গোষ্ঠীসদস্যের বাইরে যাঁরা, সেসব লেখককে অপর প্রতিপন্ন করতে চায়। যে অপর সে ভিন্নধর্মী, বিজাতীয়, ব্রাত্য, ইতর, পিছিয়ে পড়া, নিকৃষ্ট, অশ্রেষ্ঠ, বিরোধী, প্রতিকূল ইত্যাদি। ডিসকোর্সটি গোষ্ঠীসদস্যদের খাঁটি বাঙালি, এবং অন্যান্যদের অপর বাঙালি প্রতিপন্ন করতে চায়। এ প্রসঙ্গে হাওয়া ৪৯ পত্রিকার আগস্ট ২০০২ সংখ্যায় নন্দদুলাল সমাদ্দারের রচনা থেকে প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি দিয়ে আমার লেখাটা শেষ করছি ঃ--

"মূল সমস্যাটা হল পশ্চিমবাংলায়, বিশেষত কলকাতায়, বর্হিবঙ্গের বাঙালিদের মনে করা হয় অপর। অপরের কোনো নিজস্ব অপরত্ব নেই। অপরকে নির্মাণ করা হয় মস্তিস্কে। পশ্চিমবাংলায় যাঁরা বাস করেন , বিশেষত বুদ্ধিজীবীগণ, তাঁর নিজেদের মস্তিস্কে বর্হিবাংলার বাঙালিকে নির্মাণ করে নিয়েছেন। ইউরোপীয়রা এভাবেই নির্মাণ করে নিয়েছিল উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার রেড ইন্ডিয়ানদের। শারীরিকভাবে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিল তাদের। উপরের ঘটনাবলীতে স্বত প্রমাণিত যে বর্হিবঙ্গে বাঙালিদের, বিশেষত

সাহিত্যিকদের,নিশ্চিহ্ন করা হয় মানসিকভাবে। পশ্চিমবাংলায় কলকাতা শহরটি সাহিত্য - সংস্কৃতির কেন্দ্র। যাঁরা কেন্দ্র থেকে যত দূরে অবস্থান করেন তাঁরা তত প্রান্তবর্তী, সংস্কৃতিবিচ্যুত। এ কারনেই সুবিমল বসাক ও কমল চক্রবর্তীর মতন প্রতিভাসম্পন্ন ঔপন্যাসিকরা বঙ্কিম পুরস্কার পান না; আদিত্য সেন ও কিরণশঙ্কর মৈত্র অবহেলিত হন, তাঁদের নামও বিবেচনা করা হয় না। অথচ কলকাতাবাসী সাহিত্যিকরা একাধিক পুরস্কারে সম্মানিত হন।

কলকাতা যেহেতু সংস্কৃতির পীঠস্থান, কেন্দ্রবাসীগণ তাই নিজেদের মনে করেন জ্ঞানীগুণী, স্বঘোষিত পণ্ডিতপ্রবর। সুতরাং জ্ঞান বিতরণ করে প্রান্তবর্তীদের অজ্ঞানী বা মূর্খরূপে খাড়া করা যায়। আধিপত্যও বজায় রাখা যায়। ইউরোপ যেভাবে করেছিল, করে চলেছে আফ্রিকায়। বা সোভিয়েত রাশিয়া যেভাবে করেছিল মধ্য এশিয়ায়। আবার শ্রীলঙ্কা এখন যেরকমটি চালাচ্ছে তামিলদের উপর। একই নিদর্শন, তালিবানরা যেভাবে চালাচ্ছে আফগান মহিলাদের। পাকিস্তান করেছে আহ - মেদিয়াদের।অর্থাৎ কেন্দ্রবাসীর সঙ্গে প্রান্তবর্তীর সম্পর্ক সহজ বা সরল কখনো নয়। বিয়ে - শাদিহয় না। আচার - বিচারের পার্থক্য থেকে যায়। মানামানির ক্ষেত্রে কুসংস্কারের তকমাদেগে দেয়া হয়, ইত্যাদি, বোঝা গেল এই যে, কেন্দ্রে মস্তিষ্কে প্রান্তবর্তীর ইমেজটি গ্রহণযোগ্য নয়। প্রান্তবাসীর উপর অপরত্ব আরোপ করে কেন্দ্র। এই আরোপকরণেরউৎস হেগেমনি। গ্রিক অভিধাটির হিগেমেনিয়ার অর্থ হল দাপট। গ্রিক ভাষায় অভিধাটির উৎপত্তি হয়েছিল --- যেসময়ে প্রাচীন গ্রিসের সব - কয়টা নগরী রাষ্ট্র সমমান ক্ষমতাসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও আথেন্স নগরীর ছিল চূড়ান্ত হিগেমোনিযা। পরবর্তীকালেপ্রুসিয়ার হিগেমোনিয়া ছিল জার্মানিতে। একই গোষ্ঠীতে সবাই সমান হওয়া সত্ত্বেও যে দাপট ফলায় তারই হেগেমনি বা বোলবালা । সব বাঙালিই তো বাঙালি।কিন্তু দাপট ফলাল কলকাতার কর্তাব্যক্তিরা। দাপটের জোরে, প্রতাপের জেরে, অপর চিহ্নিত করেন বহির্বঙ্গের বাঙালিদের।”